রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যকলাপ প্রসঙ্গে

দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার

নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' পত্রিকার ১৮২৯ সনের ১৩ জুন তারিখের সংখ্যাটি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয় গৌড়দেশে—

... যে সকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে ...

বিশিষ্টরূপে খ্যাত হওয়া এই সকল লোককে একটি নতুন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। "এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত" বলে দাবি করবার পরে স্পেন এবং পোল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ঘোষণা করা হয় যে, এই নতুন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়নি যে সকল দেশে, সে সকল দেশে জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য এবং বশ্যতা সীমাহীন। কিন্তু যে সকল দেশে এই নতুন শ্রেণীর উদ্ভব এবং আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে, সে সকল সাধারণ মানুষের উন্নতি হয়েছে বহু দিক থেকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত করা হয় খোদ ইংল্যাণ্ডকে। দেখানো হয় যে, সে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ থেকে সকল প্রকার বাধা-বিপত্তিকে নির্মূল করার জন্য জনসাধারণ—

...ওলিবর ক্রামওয়েল নামক এক কসাইয়ের পুত্র চারল্‌স্ নামক রাজাকে শিরচ্ছেদ পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংল্যাণ্ডের প্রজার প্রভুত্ব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ করিলেন।

এই নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে বাঙলার 'সমুদয় ধন' তাবৎলোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশা প্রকাশ করেই যে একটি বিশেষ ঘোষণা করা হয়, সেটা আমাদের একটু আশ্চর্য করে তোলে ঃ

... লোকেরদিকের যখন এপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক।[১]

বাঙলায় আবির্ভূত যে নতুন শ্রেণীর প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রাজার শিরচ্ছেদের ইতিহাস শুনিয়ে বাঙলার স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথাও বলা হয়, সেই শ্রেণীটিকে অভিহিত করা হয় মধ্যবিত্ত নামে। বাঙলার জনসমষ্টির একটি অংশের মধ্যবিত্ত বা মধ্যশ্রেণী নামক একটি সুস্পষ্ট নতুন শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার পরে তার শ্রেণীগত অবস্থা ও অবস্থান, প্রত্যাশা ও প্রয়োজন, প্রস্তুতি ও উদ্দেশ্য এবং সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্যের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রথম ফসল এই প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন বঙ্গদূত পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী রামমোহন রায়।[২] আর রামমোহন রায়ই ছিলেন এই উদীয়মান নতুন মধ্যশ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

তবে নতুন বলতে যদি এই মধ্যশ্রেণীকে পুরোপুরিভাবে বৃটিশ শাসনের সৃষ্টি বলে গণ্য করা হয়, তা হলে নিশ্চয় ভুল হবে। নতুন বলতে যা বোঝায়, তা হলো কোনও নির্দিষ্ট সমাজে পূর্বে যা ছিল, তার পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা এবং বিকাশ।[৩] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পূর্বেও যেমন ছিল, পরেও তেমনই ছিল বাঙলার একটি মধ্যশ্রেণী। মুসলিম শাসনের যুগে মুসলিম লোকেরও এই মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম শাসন ব্যবস্থার নিজস্ব চরিত্রই তা হতে দেয়নি। তাই মুসলিম আমলের মধ্যশ্রেণীতেও ছিল প্রধানত হিন্দুরাই।[৪] ইংরেজ শাসনে এই মধ্যশ্রেণীটির যে পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা এবং বিকাশ হয়, সেটা শুধু পরিমাণগত নয়। সীমিত হলেও তার গুণগত দিক ছিল। এই সুনির্দিষ্ট অর্থেই ইংরেজ আমলের মধ্যশ্রেণীকে একটি নতুন শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা ঠিক।

সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম লিখেছেন ঃ

> In every society, there are social groups whose special task it is to provide an interpretation of the world for the society. We call these *intelligentsia*.[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাঙালি সমাজ তার মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে পেয়েছিল এই intelligentsia বা বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিসম্পন্ন বিভাগকে। প্রথম থেকেই নিজেদের বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এই বিভাগটি তাদের চিন্তা ও কার্যকলাপকে শুধু বাঙলার ভেতরেই সীমিত করে রাখেনি। তাদের চিন্তা ও কার্যকলাপকে অতি দ্রুত তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল সমগ্র ভারতে। কটনের ভাষায় তারাই "The Noice and brain of the country" হয়ে দাঁড়ালো। তারাই নিয়ন্ত্রণ করলো "public opinion from Peshwar to Chittagong."[৬] যদুনাথ লিখেছেন যে এই শিক্ষিত গোষ্ঠীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ—

> ...became a path-finder and a light-bringer to the rest of India ... In ...Bengal originated every good and great thing of the modern world that passed on to the other provinces of India.[৭]

রবার্ট মিচেল্‌স্‌-এর মতে যে পুরোহিতচিত গুণাবলী (priestly qualities) এবং যে পুরোহিতচিত কার্যাবলী (priestly functions) দিয়ে গঠিত হয়েছে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, বাঙলার মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই তাতে বিশেষ কোনও ঘাটতি ছিল না।[৮]

ইংরেজ শাসনে বাংলার পূর্বতন মধ্যশ্রেণীটির পরিবর্তন, ধারাবাহিকতা এবং বিকাশ হওয়ার ফলে তারা বাংলা ও ভারতের অতীতের সঙ্গে বরাবারই একটি যোগসূত্র রক্ষা করেছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ কাব্য স্মৃতি এবং জীমূতবাহন, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার রঘুনন্দন প্রমুখের ব্যাখ্যা এবং বাংলা ও ভারতের ইতিহাস এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবস্থার ভিত্তিতে তাদের প্রথম ও প্রধান প্রতিনিধি রামমোহন রায় ইউরোপের আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের বিশ্লেষণ করে অভিমত গঠন করেছেন, বক্তব্য এবং দাবিও উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং কর্মের মধ্যে অনেক পণ্ডিত শুধু

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের নয়, পাশ্চাত্যের তুলনামূলকভাবে খুব অল্প বয়স থেকেই স্বাধীন জীবনযাপনের সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক উন্নয়ন, ধর্মীয় সংস্কার এবং শিক্ষাগত উৎকর্ষ ইত্যাদির জন্য আন্দোলন করতে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। "সে জন্যই তিনি এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃত বলে শুধু ভারতেই নয়, ইংল্যাণ্ডে স্বীকৃত হয়েছিলেন।"[৯] নিজের প্রণীত তত্ত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটি আন্দোলন। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের যেমন সূত্রপাত হয়েছিল অ্যারিস্টোটলের নামের সঙ্গে, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসেরও তেমনই সূত্রপাত হয়েছে রামমোহন রায়ের নামের সঙ্গে।[১০] সে জন্যই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের উদীয়মান মধ্যশ্রেণী রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই পেয়েছিল তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রথম এবং প্রধান প্রণেতা ও নেতাকে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা

রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি রামমোহন রায়ের যে ভালবাসা ছিল, তাকে অপরিসীম বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। উইলিয়াম অ্যাডামের ভাষায় ঃ

> He did not seek to limit the enjoyment of it to any class, or colour, or race, or nation or religion. His sympathies embraced all mankind.[১১]

সকল প্রকার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বহির্ভূত রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি তাঁর যে ভালবাসা ছিল, সেটা ভৌগোলিক পরিসীমা অতিক্রম করে সমগ্র মনুষ্য সমাজকে উদারভাবেই আলিঙ্গন করলো। এমন ঔদার্য পৃথিবীর অন্য দেশে অতীতে দেখতে পাওয়া গেলেও ভারতে যে কখনোই পাওয়া যায়নি, সে বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারও কোনও সন্দেহ পোষণ করেননি।[১২] রামমোহন রায়ের আদর্শানুসারে কোনও জাতির পক্ষেই অন্য কোনও জাতির স্বাধীনতা হরণ বা পদদলিত করা উচিত নয়। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ যাতে এই উচ্চাদর্শ গ্রহণ করতে পারে বা তার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, সে জন্য তিনি সেই সব বাধা-বিপত্তিকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন যেগুলি বিশ্বের মানবজাতির মিলনের পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে চীনের প্রাচীর তুলে। একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দুরদৃষ্টি দিয়ে তিনি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই সব মৌলিক নীতি বা আদর্শ যেগুলির ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লীগ অব নেশানস। একজন বাস্তব রাজনীতিজ্ঞের মতো একটি আন্তর্জাতিক আদালতের পরিকল্পনাও রচনা করেছিলেন রামমোহন রায়। এ কথা শুনতে কার না ভাল লাগে যে ১৮৩১ সনেই রামমোহনের সিদ্ধান্ত ছিল ঃ

> ...that not religion only but unbiased common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries

feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.

সেজন্যই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কংগ্রেস বা মহাসভা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনুরোধ করলেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তিনি তাঁকে স্পষ্ট করে লিখলেন ঃ

By such a Congress all matters of difference, whether political or commercial, affecting the Natives of any two civilized countries with constitutional governments, might be settled amicably and justly to the satisfaction or both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation.[১৩]

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পৃথিবীর যেখানে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল, তার প্রতি রামমোহন রায়ের ছিল যেমন সুতীব্র আগ্রহ, তেমনি সুগভীর সমর্থন। নেপল্‌সের জনগণ তাদের স্বৈরাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে একটি সাংবিধানিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া এবং নেপল্‌সের সম্মিলিত বাহিনী সেই সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করে আবার সেখানে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। কলকাতায় এই সংবাদ এসে পৌঁছানোর পরে রামমোহন খুবই দুঃখিত হলেন।[১৪] ১৮২১ সনের ১১ আগস্ট তারিখে জে এস বাকিংহামকে লিখিত একটি পত্রে ব্যক্ত হল তাঁর সেই দুঃখ ঃ

...I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they enjoy now. Under these circumstances I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful.[১৫]

আবার স্পেনের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের জোয়াল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি উপনিবেশের মুক্ত হওয়ার সংবাদ যখন কলকাতায় এসে পৌঁছল, রামমোহন রায় তখন বিজয়ীর আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। ঘটানাটি উদ্‌যাপন করলেন তিনি তাঁর ষাটজন ইউরোপীয় বন্ধুকে একটি সন্ধ্যাকালীন ভোজসভায় আপ্যায়ন করে। এই ষাটজন ইউরোপীয় বন্ধুর প্রায় সকলেই পরিচিত ছিলেন কোম্পানি-সরকারের শত্রু বলে। পরে আবার এদের প্রসঙ্গে আসব। এই ভোজসভায় রামমোহন রায় একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৮২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত এডিনবরা ম্যাগাজিনে বলা হল ঃ

But the lively interest he took in the progress of South American emancipation, eminently marks the greatness

and benevolence of his mind, 'What!' replied he, (upon being asked why he had celebrated by illuminations, by an elegant dinner to about sixty Europeans and by a speech composed and arrival of the important news of the success...), ought I to be insensible to the 'What !' sufferings of my fellow-creaters wherever they are, or however unconnected by interests, religion, and language?'[১৬]

এই স্পেনেরই অভ্যন্তরে উল্লিখিত ঘটনার বহু পূর্ব থেকে যে সংগ্রাম চলছিল, তাতে রামমোহন রায় সমর্থন করেছিলেন উদারপন্থীদের। স্পেনের উদারপন্থীরাও এটা জানতেন।

ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য জাহাজে ওঠার কয়েকমাস পূর্বে কলকাতায় ১৮৩০ সনের ফরাসি বিপ্লবের সংবাদ এল। এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে এই বিষয়টি ছাড়া তিনি আর অন্য কোনও আলোচনা করতে বা কথাবার্তা বলতেও পারতেন না। এই বিপ্লবকে তিনি স্বাধীনতার বিজয় হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং আনন্দিত হলেন ঠিক সেইভাবেই।

সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার সময় কেপ্ অব হোপে রামমোহন রায় তাঁর পায়ে ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছিলেন। তার ফলে, পরবর্তী আঠারো মাসের মতো তিনি প্রায় খোঁড়া হয়েই ছিলেন এবং ব্যথাও ছিল তাঁর একটি পায়ে। তা সত্ত্বেও তিনি দুটি ফরাসি রণতরী দেখতে গিয়েছিলেন। এই রণতরী দুটি স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের সুগৌরবময় ত্রিবর্ণের বিপ্লবী পতাকা উড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল টেবল উপসাগরে। ত্রিবর্ণের পতাকা দুটি দেখার সঙ্গেই তাঁর মনে যে উৎসাহ বা প্রেরণার আগুন জ্বলে ওঠে, সেটা তাঁকে ভুলিয়ে দিল তাঁর পায়ের ব্যথা। জাহাজের ফরাসিরা তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ করেন। জাহাজে তুলে নিয়ে তাঁরা তাকে নিয়ে গেলেন সেই বিপ্লবী পতাকার নীচে। ফরাসি দেশের বিপ্লবী জনগণের উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় জ্ঞাপন করলেন তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। ফেরার সময় পায়ের ব্যথার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগী রামমোহন রায় চিৎকার করে বলতে থাকেন ঃ

'Glory, Glory, Glory to France !'[১৭]

রামমোহন রায় যখন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সে দেশে চলছিল তৃতীয় সংস্কার বিল (Third Reforms Bill) নিয়ে প্রবল আন্দোলন। সমগ্র দেশেই উত্তেজনা। বিলটির সাফল্যের জন্য রামমোহন রায় আগ্রহী ছিলেন অনেক পূর্ব থেকেই। ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার পরে তাঁর আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। হাউস্ অব্ কমন্স-এ বিলটির আলোচনার সময় রামমোহন বিতর্ক শুনতে যেতেন নিয়মিতভাবে। হাউস্ অব্ কমন্স্ অনুমোদন করে দেওয়ার পরে বিলটিকে যখন পাঠিয়ে দেওয়া হল হাউস্ অব্ লর্ডস্-এ, তখন প্রবল উত্তেজনার সঙ্গেই সমগ্র ইংল্যাণ্ড শেষোক্ত সভার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। বিলটিতে এমন কিছু প্রস্তাব ছিল যেগুলির দ্বারা ভারতেরও উপকার হওয়ার কথা। অতএব বিলটির সঙ্গে ভারতের স্বার্থও জড়িত ছিল। তা ছাড়াও বিলটিতে যে সমস্ত সংস্কারের ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হলে সেগুলির ফল হত সুদূরপ্রসারী। তাই রামমোহন বিলটিকে শুধু ইংরেজ জনগণের ব্যাপার বলে গ্রহণ করেননি। সমগ্র বিশ্বের এবং বিশেষ করে ভারতের অনেক কিছুই এই